International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IV, Issue-I, July 2017, Page No. 25-34
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711 Website: http://www.ijhsss.com

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকে উদ্বাস্তু সমস্যা

সুরজিৎ মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা, বিহার, ভারতবর্ষ।

Abstract

A person who has left his homeland and is temporarily living elsewhere or in another country is called refugee. Due to ethnic violence, religious frenzy, political reasons, lack of nationalism and natural and social non-sanitary conditions, people are forced to leave the homestead and become refugees. This refugee problem in Bengali drama is the most beautifully depicted in many plays of Digindrachandra Bandopadhyay. World war, natural disaster and the horrific religious riot the events have happened one after the other. Then, due to religious fanfare, countrywide refugee problems arose. In many plays of Digign Chandra Bandyopadhyay, refugee problem has gained prominence in direct and indirect way. Reflections related to refugees such as 'Deepshikha' (1944), 'Bastuvitaita' (1948), 'Nayashibir' (1982), 'Mashal' (1954), 'JeevanSrot' (1960) etc. Some one-act plays also has been compromised with partition and refugee problem. Among them, 'Purnagrash' (1948), 'Epitha-Opith' (1949), 'Opochoy' (1957), 'Simanter Dak' (1962) etc.

Key Words: refugee problem, Digindrachandra Bandopadhyay, Bengali drama, country partition, Slum life.

বাংলা সাহিত্যের নানা শাখায় নানা রূপে উদ্বাস্তু সমস্যা শিল্পরূপ লাভ করেছে। বাংলা নাটকও তার ব্যতিক্রম নয়। বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল সেন, জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রমুখের নাটকে উদ্বাস্তু সমস্যা নাট্যরূপ পেয়েছিল। এই সব নাট্যকার তাদের নাটকে মূলতঃ দেশবিভাগ ও তার ফলাফল হিসাবে উদ্বাস্তু সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। নাট্যকাররা তাদের নাটকে উদ্বাস্তু সমস্যাকে তুলে ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন করতে চেয়েছেন এবং সেই সঙ্গে ছিন্নমূল মানুষদের প্রতি সাধারণ মানুষকে সহানুভূতিশীল করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তবে শুধুমাত্র দেশভাগের কারণে উদ্বাস্তু সমস্যা সৃষ্টি হয় না। উদ্বাস্তু সমাস্যা সৃষ্টির পিছনে একাধিক কারণ থাকতে পারে।

'উদবাস্তু' শব্দের অর্থ 'বাস্তুভিটা থেকে দূরীভূত'। উদবাস্তু শব্দের সমর্থক শব্দ 'শরণার্থী'। এর ইংরেজি পরিভাষা 'Refugee'। যিনি নিজের বাসভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র বা অন্য দেশে গিয়ে অস্থায়ীভাবে বসবাস করছেন তাকে উদ্বাস্তু বলা হয়। 'UNHR' নামক ইউনাইটেড নেশন এর Refugee Agency তাদের 'Who is a refugee' বিষয়ক আলোচনায় উদ্বাস্তু এর সংজ্ঞা দিয়ে বলেছে,-

> "A refugee is someone who has been forced to flee his or her country because of persecution, war, or violence. A refugee has a well-founded fear of persecution for

reasons of race, religion, nationality, political opinion or membership in a particular social group. Most likely, they cannot return home or are afraid to do so. War and ethnic, tribal and religious violence are leading causes of refugees fleeing their countries."[১]

'UNHCR' প্রদত্ত এই সংজ্ঞা থেকে উদ্বাস্তু শ্রেণি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এই সংজ্ঞায় উদ্বাস্তুদের বাস্তু ত্যাগের মূল কারণগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। মূলতঃ জাতিগত হিংসা, ধর্মীয় উন্মাদনা, রাজনৈতিক কারণ, জাতীয়তা বোধের অভাব এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে মানুষ বাস্তুভিটা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। নিরাপত্তাহীনতাই বাস্তুভিটা ত্যাগের মূল কারণ। সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে মানুষ তার বহুদিনের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ত্যাগ করে নিরুদ্দেশে পাড়ি দিতে বাধ্য হয়। কখনো একই দেশের মধ্যে আবার কখন ভিন্ন দেশের মাটিতে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নেয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই আশ্রয় নিরাপত্তার বদলে চরম অনিশ্চয়তার দিকেই ঠেলে দেয়। পূর্বপুরুষের স্মৃতিবিজড়িত জন্মভূমি ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নতুন জায়গায় নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতি অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়। বাংলা সাহিত্যে বাস্তুভিটা ত্যাগের এই বেদনা কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটকে প্রবন্ধে বিচিত্ররূপে চিত্রায়িত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে উদ্বাস্তু সমস্যা সচেতন ভাবে চিত্রিত হলো বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে। সেই সময় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক দুঃস্বপনের নগরী নির্মাণ করে তোলে। ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসাবে যুদ্ধভাণ্ডারে দিতে হয়েছে দেড়শো কোটি টাকা। দেশবাসীর উপর চেপে বসেছে বিপুল করভার। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের অবস্থা শোচনীয় হয়েছে। ইংরেজ প্রচলিত শিক্ষায়, শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু যুদ্ধকালীন বিশৃঙ্খলায় সঠিক কর্মোদ্যোগ এর নিদারুণ অভাব। অভাবের তাড়নায় সাধারণ মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে শহরের রাস্তায় রাস্তায় এসে দাঁড়ায়।

ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) আর এক বড়ো ধাক্কা। এক শ্রেণির মুনাফাখোর যুদ্ধের বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে বাজার থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য উধাও করে দেয়। বাজারে খাদ্যদ্রব্যের কৃত্তিম আকাল তৈরী হয়। এর সঙ্গে বাংলাদেশের কয়েকটি জেলায় ১৯৪২ সালের ১৬ই অক্টোবর ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে প্রচুর ক্ষতি হয়। উত্তর ২৪ পরগণার, হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি ছিল।[২] প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে শহরে এসে ভীড় করে গ্রামের মানুষ। খাদ্যহীন, বাসস্থানহীন, মানুষগুলোর উপর মহামারী চড়াও হয়। কলকাতার মতো বিভিন্ন শহরের রাস্তা-ঘাট 'ফ্যানপ্রার্থী' কঙ্কালসার উদ্বাস্তুতে ভরে যায়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মন্বন্তর এর পরেই শুরু হয় ভয়াবহ ধর্মীয় দাঙ্গা। ভয়ংকর এই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা নতুন করে উদ্বাস্তু শ্রেণি সৃষ্টি করে। শুধু এদেশে নয় পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে ধর্মীয় দাঙ্গার কারণে বহু মানুষ ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। এই নৃশংসতা আজও অব্যাহত আছে। ভারতবর্ষেও একাধিক ধর্মীয় দাঙ্গা সামাজিক নিরাপত্তা নষ্ট করেছে। এর মধ্যে ১৯৪৬ এর কলকাতার দাঙ্গা এবং নোয়াখালি ও তিপের জেলার দাঙ্গা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।[৩] এই দাঙ্গাগুলির ভয়াবহতা ছিল মারাত্মক। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের আগেই পূর্ব পাকিস্থানে লীগ সরকার মুসলিমদের প্রাধান্য দিতে থাকে। এরফলে পাকিস্থানের হিন্দুরা দলে দলে কলকাতা অভিমুখী হতে থাকে। অন্যদিকে ভারতবর্ষের তথা পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের হিংসার শিকার হয়ে মুসলিমরা পূর্ববঙ্গে চলে যেতে থাকে। এরই সাথে সাথে চলতে থাকে বিধর্মী হত্যা। এতদিন একত্রে ভাই ভাই রূপে বসবাসকারী হিন্দু মুসলিম সেদিন পাশবিক দাঙ্গায় মেতে ওঠে। এই দাঙ্গায় ভীত সন্ত্রস্ত উদ্বাস্তুতে কলকাতার জনপথ ভরে ওঠে।

১৯৪৭ সালের দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা ধর্মীয় উত্তেজনাকে প্রশমিত করতে পারেনি বরং হিন্দু মুসলিম মেরুকরণ আরও নির্লজ্জভাবে প্রকট হয়। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে পূর্ববঙ্গ থেকে দলে দলে হিন্দুরা তাদের সাধের বাস্তুভিটা

ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে গড়ে তোলা হয় অস্থায়ী উদ্বাস্তু শিবির। কাঁটাতার পেরিয়ে এই যাতায়ত দীর্ঘদিন অব্যাহত ছিল। উদ্বাস্তু সংক্রান্ত একটি পরিসংখ্যান বলছে[৪],-

১৯৪৬-১৯৫০ সাল পর্যন্ত এদেশে এসেছে- ২০,৪২,০০০ জন।
১৯৫১-১৯৬০ সাল পর্যন্ত এদেশে এসেছে- ১১,৩০,০০০ জন।
১৯৬০-১৯৭০ সাল পর্যন্ত এদেশে এসেছে -১০,৩৭,০০০ জন।

একটি সরকারি পরিসংখ্যান[৫] অনুসারে ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত শুধু পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল ৪২,৫৯,৬০৪ জন। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র জনসংখ্যার নিরিখে দেখা যায় ১৩.৫৪% মানুষ উদ্বাস্তু। ১৯৭০ সালের পরেও বিভিন্ন কারণে উদ্বাস্তু আগমন ঘটেছে।

বাংলা সাহিত্যে উদ্বাস্তু সমস্যা কেন্দ্রিক অসংখ্য নাটক রচিত হয়েছে এবং তা সফল ভাবে মঞ্চায়িতও হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে সবচেয়ে বেশি নাটক লিখেছেন গণনাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯০৮ সালে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের আদাবাড়ি গ্রামে দিগিন্দ্রচন্দ্রের জন্ম।[৬] তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে পূর্ববঙ্গে। যৌবনে আইনঅমান্য আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করেন। পরবর্তীতে কর্মসূত্রে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় আসেন। ১৯৪৭ সালে তাঁর চোখের সামনেই তাঁর প্রিয় জন্মভূমি দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। তিনি হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছেন দেশভাগের যন্ত্রণা। দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতার শিকার হয়ে যারা পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল তিনি তাদের সমব্যাথী ছিলেন। তিনি যখন পূর্ববঙ্গ থেকে এসে কলকাতার বাগুইআটিতে থাকতেন তার বাড়ির পাশেই ছিল উদ্বাস্তু শিবির। বামপন্থী আন্দোলনের সূত্রে তিনি উদ্বাস্তু কলোনীতে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। নিজে চোখে দেখেছেন ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের জীবনযুদ্ধ। গণনাট্য সঙ্ঘের দায়িত্ববান কর্মী হিসাবে মানুষের যন্ত্রণাকে নাটকের মাধ্যমে মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। উদ্বাস্তুদের প্রতি স্থানীয় মানুষ ও প্রশাসনের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন।

দিগিন্দ্রচন্দ্রের একাধিক নাটকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে উদ্বাস্তু সমস্যা প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর উদ্বাস্তু সমস্যা কেন্দ্রিক নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম হল,- **'দীপশিখা'**(১৯৪৪), **'বাস্তুভিটা'**(১৯৪৮), **'নয়াশিবির'**(১৯৮২), **'মশাল'**(১৯৫৪), **'জীবনস্রোত'**(১৯৬০) প্রভৃতি। কয়েকটি একাঙ্ক নাটকেও দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এর মধ্যে **'পূর্ণগ্রাস'**(১৯৪৮), **'এপিঠ-ওপিঠ'**(১৯৪৯), **'অপচয়'** (১৯৫৭), **'সীমান্তের ডাক'**(১৯৬২) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

'দীপশিখা' নাটকটির উৎসর্গ পত্রে লেখা হয়েছে,-'১৯৪৩ এর মন্বন্তরে বাংলার অকালে যাদের জীবনদীপ নিভে গেল তাদের স্মৃতির উদ্যেশ্যে।'[৭] অর্থাৎ পঞ্চাশের মন্বন্তরের কবলে পড়ে অকালমৃত উদ্বাস্তুদেরকে তিনি তাঁর 'দীপশিখা' নাটকটি উৎসর্গ করেছেন। নাটকটির কেন্দ্রীয় চরিত্রে আছে একজন গ্রাম্য গৃহবধূ, যে মন্বন্তরের কবলে পড়ে উদ্বাস্তু হয়ে দুটি সন্তানকে নিয়ে শহরের এসে আশ্রয় নেয়। না আছে ঘর, না আছে খাবার। শহরের হৃদয়হীন ইমারতের জঙ্গলে সারাদিন কিছুটা ফ্যান প্রার্থণা করে বেড়ায়। নীরস শহরে জীবনের রস(ফ্যান) সন্ধান করে- এ যেন উদ্বাস্তু মানুষগুলোর জীবনে এক Irony. তাদের প্রার্থণা প্রায়শই ব্যর্থ হয়ে যায়। নাটকের শুরুতেই এই বৈপরীত্য চোখে পড়ে,- "সমবেত পুরুষ কণ্ঠে বিকট চিৎকার-ক্ষুধা, ক্ষুধা, খেতে দাও, খেতে দাও।" [৮] অন্যদিকে হৃদয়হীন শহুরে মানুষের, "সমবেত নারীকণ্ঠে অট্টহাসি- হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ!"[৯] মন্বন্তর গ্রামের সুখী গৃহস্থ পরিবারগুলিকে ভিখারী বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু দুর্দিনে ভিক্ষা দেবে কে? নাটকে অন্ধ ভিখারীর সংলাপে তার আভাস মেলে,- "উঃ! কি হলো বাবা! সারাদিন ঘুরেও দুটো পয়সা মেলে না। হা ভগবান এতো লোককে দ্যাখো তুমি অন্ধকে দ্যাখ না।"[১০] দুর্ভিক্ষ তাকেই বলে যখন ভিক্ষা মেলে না। পঞ্চাশের মন্বন্তর ছিল আক্ষরিক অর্থেই মহামন্বন্তর। যে বিপুল পরিমাণ উদ্বাস্তুতে শহর ভরে গিয়েছিল তার বিশালতা মঞ্চে দেখানো সম্ভব নয়। এখানে

একজন গৃহবধূর মাধ্যমে সমগ্র উদ্বাস্তু শ্রেণির সমস্যাকে দেখানো হয়েছে। গৃহবধূটির মুখে শোনা যায় তার দুর্দশার কথা,-

> "বাবুগো আমি চোর নই। ছিলেম বড়ো চাষী বৌ। পেটের জ্বালায় কলকাতায় এসেছি। এখন আমি ভিক্ষে করে খাই। আকালে আর ভিক্ষে মিলছে না। বাচ্চা দুটো দুদিন ধরে না খেয়ে ক্ষিদের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করছে। এমন কিছুই নেই ওদের মুখে তুলে দিই। রাস্তায় পড়ে তোমার যে চাল নষ্ট হচ্ছিল তাই আমি কুড়িয়ে নিচ্ছিলুম। আমি চোর নই বাবু, আমায় ছেড়ে দাও, আমি চোর নই।"[প্রথম দৃশ্য][১১]

এই গ্রাম্য গৃহবধূটি ভিক্ষা করেও তার সন্তান দুটিকে বাঁচাতে পারেনি। ছোট ছেলেটা 'খেতে দাও, খেতে দাও' বলে ক্ষুধায় কাঁদতে কাঁদতে মারা যায়। মেয়ে নীলা হারিয়ে যায় উদ্বাস্তুদের ভীড়ে।

উদ্বাস্তুদের সাহায্য করার জন্য সেদিন বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠন তাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। গড়ে তুলেছিল আশ্রয় শিবির, মেডিকেল ক্যাম্প, শিশু শিবির প্রভৃতি। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং নামমাত্র সরকারী সাহায্যে সেদিন অনেক দুর্মূল্য প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল। 'কেন্দ্রীয় আত্মরক্ষা সমিতি'-র এক সদস্যা হারিয়ে যাওয়া নীলাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে এনে দেয়। ঘর-বাড়ি, সংসার, ছেলেকে হারিয়ে একমাত্র মেয়ে নীলা হয়ে ওঠে দুঃখিনী মায়ের বাঁচবার দীপশিখা।

নাটকে উদ্বাস্তু মানুষের দুর্দশার নানা দিক সচেতন ভাবে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। মন্বন্তরের ভয়াবহতা, উদ্বাস্তুদের জীবন সংগ্রাম, খাবারের জন্য লড়াই, অনাহারে মৃত্যু, বেসরকারী ও সরকারী সাহায্যের অপ্রতুলতা ইত্যাদি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সার্থক ভাবে নাট্যরূপদান করেছেন নাট্যকার এই নাটকে।

'বাস্তুভিটা' নাটকটি ১৯৪৭ সালে দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতার পটভূমিতে রচিত হয়েছে। দেশ ভাগের ফলে যে সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতার জন্ম হয়েছিল তাতে বাধ্য হয়ে ঘর ছেড়েছিলেন বহু মানুষ। লীগ সরকারের কট্টরবাদী মনোভাব পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের জীবনে সংকট এনে দিয়েছিল। নিরাপত্তার অভাবে দলে দলে হিন্দুরা ভিটেমাটি ত্যাগ করে এদেশে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল। এই আকস্মিক দেশভাগকে গান্ধিজি তুলনা করেছিলেন জীবিত প্রাণীর শব ব্যবচ্ছেদের সঙ্গে। এর ফলও হয়েছিল সুদূর প্রসারী। "উপমহাদেশের চার প্রজন্মের মানুষকে যন্ত্রণায় দগ্ধ করেছে এই ঘটনা, মানুষের মনস্তত্ত্বকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।"[১২] এই নাটকে পূর্বঙ্গের একজন সাধারণ স্কুল মাস্টারের বাস্তুত্যাগের বেদনাকে দেখানো হয়েছে। দেশবিভাগ রাতারাতি মানুষের মনকে বদলে দিয়েছিল। এতদিনের প্রতিবেশী বন্ধুরা আচমকা ধর্মীয় শত্রুতে বদলে গিয়েছিল। এর ফলে মানুষ ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়। সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে দুদেশেই উদবাস্তুর আনাগোনা চলতে থাকে। নাটকের শুরুতেই তার উল্লেখ আছে,- "চৌধুরীরা বাড়িঘর বেচে দিয়ে চলে যাচ্ছে.....মুখুজ্জে বাড়ির সাতপুরুষের শালগ্রাম তাও তারা পার কল্লে.....মিত্তিরদের বাড়িটাও নাকি বেচে দেবে..."[১৩] পূর্ববঙ্গের এই অখ্যাত গ্রামে বাস করেন নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের পণ্ডিত মহেন্দ্র অধিকারী। হিন্দু-মুসলিম পাশাপাশি বাস। শিক্ষকতার সূত্রে মহেন্দ্র মাস্টারের সঙ্গে উভয় ধর্মের মানুষের সমান সদ্ভাব ছিল। কিন্তু দেশভাগের পর মুসলিমদের অত্যাচার বেড়ে যায়। তবুও মহেন্দ্র মাস্টার বাস্তুভিটা ত্যাগ করতে চায় না। এর দুটো কারণ ছিল,-

[এক] "উঠব গিয়ে কোথায়"?

[দুই] "হাওয়া খেয়ে তো আর বাঁচা যাবে না! পাকিস্থান হোক গোরস্থান হোক এখানেই আমাদের থাকতে হবে। .....গরীবের যাবার জায়গা আছে নাকি!"[১৪]

-গরীব মানুষের এই সমস্যা তাদের উদ্বাস্তু জীবনকে মহাসংকটে ঠেলে দিয়েছিল। মহেন্দ্র মাস্টার শেষ পর্যন্ত বাস্তুভিটা ত্যাগ করতে পারেনি কারণ সেখানে খারাপ মানুষের পাশাপাশি আমীন মুন্সীর মতো ভালো মানুষও ছিল।

যাদের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক ধর্মীয় সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। তাদের ব্যাকুল আহ্বানে তাকে বাস্তুভিটাতেই থেকে যেতে হয়েছিল।

নাটকে উদ্বাস্তু হওয়ার নানা সমস্যা ও মানসিক যন্ত্রণা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মিত্তির বাড়ির শচীন তাদের পূর্ববঙ্গের বাড়ি বিক্রি করে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিতে চায়। প্রায় জলের দামে ভিটেমাটি বিক্রি করতে গিয়ে দেশ ত্যগের যন্ত্রণা ঝরে পড়ে তার সংলাপে।

"মহেন্দ্রঃ চৌদ্দ পুরুষের বাস্তুভিটা বেচে দেবে?
শচীনঃ ইচ্ছে ছিলনা; কিন্তু আর রেখেই বা কি করবো! বেচে না দিই বাড়ি বেহাত হয়ে যাবে।" [১৫]

-এই বাস্তুভিটা ত্যাগের যন্ত্রণা প্রতিটি উদ্বাস্তুকে কুরে কুরে খেয়েছে। দেশভাগের যন্ত্রণা এই নাটকের মূল বিষয় হলেও উদ্বাস্তুর মানসিক যন্ত্রণা, তাদের সমস্যা এই নাটকে বিস্তারিত ভাবে পাওয়া যায়। উদ্বাস্তু রোধের জন্যই নাট্যকার এই নাটকে হিন্দু-মুসলিম এর সৌহার্দ্য পূর্ণ সহাবস্থানে নাটক শেষ করেছেন।

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের এক হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা নিয়ে তিনি লিখেছিলেন **'মশাল'** নাটকটি। ১৯৪৬ সালের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর ১৯৪৭ এর স্বাধীনতা কিছুটা শান্তি এনেছিল তবে মানুষের মন থেকে সাম্প্রদায়িকতাকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারেনি। পূর্ববঙ্গে মুসলিমদের আর পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের বসবাসের ধর্মীয় মেরুকরণ চলতে থাকে। আর দুদেশেই ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার শিকারগ্রস্ত উদ্বাস্তুর ভীড় জমতে থাকে। ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পুনায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়। "১৯৫০ এর ফেব্রুয়ারিতে যে দাঙ্গা হলো তা একই সংস্কৃতির অন্তর্গত দুটি সম্প্রদায়কে আরও বিচ্ছিন্ন করল। এ দাঙ্গার উৎস কি এবং কোন পদ্ধতিতে ঘটতে পারে তার বিলোপ এ ধরনের আবেগ থেকে দিগিন্দ্রচন্দ্র লিখলেন 'মশাল'।"[১৬] দাঙ্গা ও দেশবিভাগের ফলে সমস্যাগ্রস্ত একাধিক মানুষের দেখা পাওয়া যায় এই নাটকে।

প্রধান চরিত্র মতি পূর্ববঙ্গের লোক। সম্ভবত দেশভাগের সময় ভিটেমাটি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। মাথা গোঁজার ঠাঁই মিলেছে কলকাতা শহরতলির কোন এক ঘিঞ্জি বস্তিতে। পেটের খিদে নিবারণের জন্য একটি লোহা কারখানায় কাজ করে। কিন্তু সেখানে শ্রমিক মালিক পক্ষের মধ্যে চলে নিত্য অশান্তি। মতি এবং আরও কয়েকজন শ্রমিক মার্ক্সবাদী শ্রেণিচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়াই করতে চেষ্টা করে। মালিক পক্ষ গুণ্ডা বাহিনীর সাহায্যে আন্দোলন দমনের চেষ্টা করে। শ্রমিকদের মধ্যে ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি করে। এর পাশাপাশি চলে শ্রমিক ছাটাই। মতি ও তার বন্ধুরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে চেষ্টা করে। মতির বোন ললিতা সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়ে বিধবা হয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে এসে মতির কাছে আশ্রয় নেয়। দাঙ্গায় তার একমাত্র পুত্র দুলাল মারা যায়। কলকাতায় এসে মতির মুসলিম বন্ধু জালালের একমাত্র পুত্র জয়নালকে মাতৃস্নেহে রক্ষা করতে চেষ্টা করে কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি। দাঙ্গাবাজরা মতির বুক থেকে জয়নালকে কেড়ে নিয়ে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে। ললিতা দ্বিতীয়বার সন্তানহারা হয়।

জালাল সাত পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে পূর্ববঙ্গে যেতে চায় না। জালাল বলে,- "হ্যাঁ, পাকিস্তানের লোকের কাছে তার জন্মভূমি বেহেশত .....খালি আমি কেন, আমার মতো এই কারখানার অনেক মজদুরই চায়না পশ্চিমবাংলা ছেড়ে পাকিস্তানে গিয়ে ভিখিরি হতে।"[১৭] এই নাটকে নাট্যকার উদ্বাস্তু মানুষের জীবন সংগ্রামের বাস্তব সমস্যাগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেছেন। নাট্যকার দেখিয়েছেন দাঙ্গাবাজদের কোন জাত হয় না এরা নর-পিশাচের সমান, এরা শুধু রক্ত আর হত্যা চায়। বস্তিতেও উদ্বাস্তু মানুষের জীবনযাত্রা সুরক্ষিত নয়। ধর্মীয় মৌলবাদ, ঘৃণ্য রাজনীতি আর ফায়দাবাজ ধনতন্ত্র উদ্বাস্তু মানুষগুলোর জীবনে দুষ্ট গ্রহের মতো লেগে ছিল। নাট্যকার সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই সমস্যার মোকাবিলা করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মশাল জ্বালাতে চেয়েছেন।

'জীবনস্রোত' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র গীতা এক উদ্বাস্তু অনাথ মেয়ে। নাটকে এই উদ্বাস্তু ও অনাথ গীতাকে কেন্দ্রকরেই সমস্ত জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। তবে নাটকের মধ্যে মার্ক্সীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সঙ্গে অধ্যাত্মনির্ভর ভাববাদের দ্বন্দ্ব সমস্যাকে জটিলতর করে তুলেছে। যথাক্রমে অধ্যাপক জিতেন্দ্র ও আশ্রমকন্যা গীতা –এই দুই মতবাদের পরিপোষক। যাইহোক নাটকে উদ্বাস্তু ও অনাথ হওয়ার কারণে জিতেন্দ্রর সঙ্গে গীতার প্রেম সমস্যা জটিল রূপ নিয়েছে।

পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় গীতা তার বাবা-মা ও অন্যান্য স্বজনদের হারিয়েছে। একজন সহৃদয় মুসলমান প্রতিবেশীর সহায়তায় সে কোনরকমে কলকাতায় এসে পৌঁছায়। কিন্তু স্বজনহীন উদ্গাত যৌবনা গীতা কলকাতায় দুষ্ট নারী পাচারচক্রের হাতে পড়ে। অঘোরানন্দ তাকে এই দুষ্ট চক্রের হাত থেকে রক্ষা করে স্বামী তেজসানন্দের আশ্রমে নিয়ে আসে। গীতা উদ্বাস্তু জীবনের ভয়াল অভিজ্ঞতার সাক্ষী। আশ্রমে আশ্রয় পেয়ে প্রাণের সংকট থেকে রক্ষা পেলেও মানসিক সংকট বেড়ে গিয়েছিল। উদ্বাস্তু গীতার কাছে নাম, পরিচয়, ধর্ম, জাতি, গোত্র এর কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ ছিল না। তাই ভালো ঘর, ভালো বর তার জীবনে অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়ায়। স্বামী তেজসানন্দের কথায়,-"তোমরা আশ্রম কন্যা, সকলের কূল-গোত্র জানিনে। কোনো গৃহীই কি সরল মনে হৃষ্টচিত্তে তোমাদের গ্রহণ করবে মা?"[১৮] নাটকের শেষে অবশ্য জিতেন্দ্রের মা এবং স্বামী তেজসানন্দের উদ্যোগে গীতার সঙ্গে অধ্যাপক জীতেন্দ্রের বিয়ে হয়েছিল। নাট্যকার এই নাটকে গুরুগম্ভীর ভাবের দ্বন্দ্বের পাশাপাশি এক উদ্বাস্তু কন্যার প্রেম সমস্যাকে সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন।

উদ্বাস্তু সমস্যার সর্বত্তোম প্রতিফলন দেখা যায় **'নয়াশিবির'** নাটকে। বাস্তুভিটা নাটকটি পড়ে কমরেড রেণু চক্রবর্তী নাট্যকারকে অনুরোধ করেছিলেন,- 'বাস্তুভিটা ত্যাগের বেদনাকে রূপ দিয়েছিলেন এবার বাস্তু ছেড়ে এসে এপারে যারা উদ্বাস্তু হলো তাদের দূর্গতি নিয়ে একটা নাটক লিখুন।'[১৯] এই অনুরোধ রক্ষা করতে নাট্যকার 'নয়াশিবির' নাটকটি লিখেছিলেন।

নাটকের পটভূমি কলকাতার উপকণ্ঠের এক উদ্বাস্তু কলোনী। তাই নাটকের বেশিরভাগ পাত্র-পাত্রীই উদ্বাস্তু। দেশ ভাগের সময় নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে এরা সবাই পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। ভারত সরকার পুনর্বাসন দেবার নাম করে বিহার ওড়িশায় পাঠিয়েছিল কিন্তু বাংলাদেশের নদী-নালার দেশের নমনীয় শরীর নিয়ে তারা বিভূমির শুষ্ক মাটিতে থাকতে পারেনি। পশ্চিমবাংলায় ফেরার পর তাদের ঠাঁই মিলেছে বাগুইয়াটির খাল পাড়ের একটি উদ্বাস্তু কলোনীতে। সরকারের খালের মাটি কাটার বিনিময়ে তারা 'ক্যাশ-ডোল' পায়। উদ্বাস্তু অধর দাস ও তার কন্যা বাসনা বাগুইয়াটির খাল পাড়ের এই উদ্বাস্তু কলোনীতে বাস করে। তাদের জীবনে সমস্যার শেষ নেই। প্রথম ও প্রধান সমস্যা বাসস্থান। অধর দাস বলে- "কন তো এই অবস্থায় মানুষ থাকতে পারে! মাঠে থইথই করতেছে জল। ঐ তো এতটুকু কইর‍্যা একখান তাম্বু-তাও আবার ছিঁড়া। মেঘ নামলে সব বাইস্যা যায়। পোলাপান লইয়্যা তার মধ্যে থাকন যায়!"[২০] বাসস্থান সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে আছে খাদ্য, বস্ত্র, নিরাপত্তার সমস্যা তবে সবচেয়ে বড়ো হল অর্থ সমস্যা। অধর দাস দুঃখ করে বলে,- "অমন বাড়বাড়ন্ত লক্ষীর মতো মাইয়্যা-বাপ অইয়্যা তারে না পারি প্যাটের ভাত যোগাইতে, না পারি পরনের কাপড়খান জুটাইতে..."[২১] ঘিঞ্জি বস্তিতে এভাবে পশুর মতো দিন কাটে উদ্বাস্তুদের। কিন্তু সমস্যা এখানেই শেষ নয়। কেষ্ট মোড়ল ধর্মদাস এর মতো ধনবান সুবিধাভোগী স্বার্থপর মানুষেরা অসহায় উদ্বাস্তুদের উপর ছড়ি ঘোরাতে চায়। কয়েকজন স্বার্থপর মানুষ উদ্বাস্তুদের সঙ্গে স্থানীয় চাষীদের লড়াই বাঁধিয়ে দেয়। সবাই অবশ্য খারাপ নয়। স্থানীয় যুবক রাখাল(রাখু) উদ্বাস্তুদের সংগঠিত করে সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করার পরামর্শ দেয়। জনৈকা উদ্বাস্তু প্রৌঢ়া সুখদা বলে,- "লড়াই! রাখু, আর কত লড়াই করুম রে? তগো লগে লড়াই, সরকারের লগে লড়াই, ক্ষুধার লগে লড়াই। নিজেগো লগে লড়াই- মানুষ কত লড়াই কত্তে পারে?"[২২] জীবন যুদ্ধে পরাজিত কয়েকজন উদ্বাস্তু আন্দামান দ্বীপে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। স্থানীয় যুবক রাখালকে

ভালবেসে বাসনা সেখানেই থেকে যায় শেষ পর্যন্ত। রাখাল বাকি উদ্বাস্তুদের নিয়ে সুসংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমে নয়াশিবির গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে।

নাটকটিতে উদ্বাস্তু সমস্যার বিভিন্ন দিক সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে। এই নাটকে নাট্যকার দেখিয়েছেন উদ্বাস্তুদের জীবনের কোনো মৌলিক চাহিদাই পূর্ণ হয়নি। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, জীবিকা, প্রেম, নিরাপত্তা ইত্যাদি সব চাহিদাই অধরা রয়ে গেছে। অথচ একদিন পূর্ববঙ্গে এদের সবই ছিল। নাট্যকার নাটকের 'নেপথ্য ভূমিকা' অংশে জানিয়েছেন যে উদ্বাস্তু আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হিসাবে তিনি ঘুরে বেড়াতেন বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে। বাগজোলা খাল কাটার সময় নিয়োজিত উদ্বাস্তু তাবুগুলি ঘুরে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখেছেন এই নাটক। গণনাট্য আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র কেবলমাত্র উদ্বাস্তু সমস্যা দেখিয়েই থেমে যাননি। সুসংঘঠিত আন্দোলনের মাধ্যমে উদ্বাস্তুদের প্রকৃত অধিকার আদায়ের পথও তিনি প্রশস্ত করেছিলেন।

পূর্ণাঙ্গ নাটকের পাশাপাশি একাঙ্ক নাটকেও তিনি উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে সমান ভাবে সরব হয়েছিলেন। উদ্বাস্তু সমস্যা কেন্দ্রিক তাঁর একাঙ্ক নাটকগুলির মধ্যে **'পূর্ণগ্রাস'**(১৯৪৮), **'এপিঠ-ওপিঠ'**(১৯৪৯), **'অপচয়'**(১৯৫৭), **'সীমান্তের ডাক'** (১৯৬২) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'পূর্ণগ্রাস' নাটকের মূল বিষয় উদ্বাস্তুদের জীবিকা ও বাসস্থান সমস্যা। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার চিরদিন একইভাবে চলে আসছে। এই নাটকেও উদ্বাস্তু মানুষগুলোর উপর জমিদারী অত্যাচার 'মরার উপর খাঁড়ার ঘা' হয়ে নেমে আসে। কলকাতার নিকটবর্তী এক উদ্বাস্তু কলোনী এই নাটকের ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু। বস্তির সবাই প্রায় বিভিন্ন কারখানায় শ্রমিকের কাজ করে। উদ্বাস্তুদের ভীড় বাড়তে থাকায় প্রায় প্রতিটি কারখানা নির্বিচারে শ্রমিক ছাঁটাই করতে থাকে। শুরু হয় বস্তিবাসীদের জীবন ও জীবিকার সংকট। যারা এখনো ছাঁটাই হয়নি তারা যেকোন মুহূর্তে কর্মহীন হওয়ার আশঙ্কায় ভোগে। মাধব যে কারখানায় কাজ করে সেখানে গত ছ'মাস ধরে কর্মী ছাঁটাই এর আলোচনা চলছে। এদিকে এই সামান্য আয় থেকে বাড়ির সংসার খরচ চালাতেই হিমশিম খেতে হয় এরপর কাজ চলে গেলে কিভাবে চলবে সংসার, কোথায় পাবে নতুন কাজ এসব চিন্তা বাড়তে থাকে। সমস্যা এখানেই শেষ হয় না, স্থানীয় জমিদার, প্রশাসনকে ব্যবহার করে বস্তি উচ্ছেদ করে জমি দখল করতে চেষ্টা করে। ধ্বংস স্তূপের নীচে চাপা পড়ে মাধব-জয়ার একমাত্র শিশুপুত্রটি মারা যায়।

খাদ্য, বাসস্থান ও জীবিকার সংকট এই নাটকে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। নাটকে অলইণ্ডিয়া রেডিওতে একটি ঘোষণা শোনা যায়,- "পূর্বপাকিস্তান থেকে যে সকল বাস্তুহার পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নিয়েছে তাদের পুণর্বসতির জন্য ভারত গবর্ণমেন্ট বাংলা গবর্ণমেন্টকে আরও এক কোটি টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"[২৩] প্রতিশ্রুতি আসে প্রতিশ্রুতি যায়, সাহায্য আসে সাহায্য শেষ হয়-উদ্বাস্তুদের জীবন দুর্বিসহ অন্ধকারেই নিমজ্জিত রয়ে যায়। নাটকে উদ্বাস্তুদের বাস্তুভূমির আন্দোলন শেষ পর্যন্ত জারি থাকে।

'এপিঠ-ওপিঠ' নাটকে উদ্বাস্তু সমস্যার একটি বিশেষ দিক প্রতিফলিত করেছেন নাট্যকার। দেশ ভাগের সময় পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের কেউ কেউ পশ্চিমবঙ্গের আত্মীয় বা দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে এসে উঠেছিল। আত্মীয়ের বাড়িতে দুর্দিনে আশ্রয় নিয়ে কি রকম সমস্যা ভোগ করে হয়েছিল এ নাটকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্দিনে করুণা তার স্বামী ও কন্যাকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বোনের সংসারে এসে আশ্রয় নেয়। অভাবের সংসারে বাড়তি বোঝা এলে সমস্যা জটিল রূপ নেয়। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে দুই বোন প্রায়ই ঝগড়া করে। একদিন ঝগড়া এতটাই বেড়ে যায় যে, বড়ো বোন ছোটবোনের সংসার ছেড়ে ফুটপাতে আশ্রয় নিতে বেরিয়ে যেতে চায়। আকস্মিক ভাবে ছোটবোনের মানসিক পরিবর্তন ঘটে। ছোটবোনের মনের একপিঠে অভাবের দুঃখ প্রকাশ পেলেও অন্যপিঠে প্রকাশ পায় উদ্বাস্তু বড়ো বোনের প্রতি ভালোবাসা। অবশেষে বড়ো বোনকে আটকে রাখে নিজের বাড়িতে। করুণা দুঃখ করে বলে,- "যে দিন পাকিস্তান হয়েছে সেদিন আমাদের কপাল পুড়েচে, সোনার দেশ ছেড়ে এখানে এসেছি মরতে।"[২৪] করুণার স্বামী একটি চাকরীর চেষ্টায় সারাদিন শহরের অফিসে অফিসে ঘুরে বেড়ায়। উদ্বাস্তুর ভীড়ে

ভরা শহরে কোথাও চাকরী খালি নেই । "ছ'মাস ঘুরচি, এখন দেখচি ছ'বছরেও কিছু হবে না। এদের ওপর বোঝা হয়েই বা আর কতদিন থাকা যায়।" [২৫]

দুর্দিনে পরম আত্মীয়ও অনাত্মীয় হয়ে যায়। তবে এই নাটকে ঘৃণার অপর পিঠে লুকিয়ে থাকা ভালোবাসা ও মানবিক মূল্যবোধকেই জয়ী করেছেন নাট্যকার।

উদ্বাস্তু পরিবারের প্রেম সমস্যা **'অপচয়'** নাটকটির মূল বিষয়। দরিদ্র কুলীন বিধবা সুশীলা তার তিন মেয়ে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু কলোনীতে আশ্রয় নেন। বিবাহযোগ্যা কন্যাদের জন্য পাত্র খুঁজতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন। একদিকে দরিদ্রতা অন্যদিকে বংশ কৌলীন্য কিভাবে কন্যাদের কৌলীন্য রক্ষা করবেন তিনি? ভাবেন,- "দ্যাশগাও ছাইর‍্যা আইয়্যা করোরে তো চিননের উপায় নাই। ছোট বড়ো, সাধু চোর বানের জলের মতো সব একাকার অইয়্যা গেছে।"[২৬] প্রতিবেশী চোর ও লম্পট যুবক ফটিকের সঙ্গে বড়ো মেয়ে সন্ধ্যার বিয়ে দেবেন বলে স্থির করেন, সন্ধ্যা বেঁকে বসে। সন্ধ্যা ভালোবাসে নীচু জাতের এক গরীব হকার যুবক মিলনকে। সন্ধ্যা বলে,- "গরীবগো আলাদা জাইত আছে নাকি মিলনদা? তাগো একই জাইত তারা গরীব।"[২৭] নীচুজাতে মেয়ের বিয়েতে সুশীলা আপত্তি জানায়। ব্যাঙ্গের চাবুকহেনে সন্ধ্যা বলে ওঠে,- "দ্যাশ বাঙ্গলো, বাড়ি বাঙ্গলো, কপাল বাঙ্গলো, তবু আমাগো কুল বাঙ্গলো না, মা? তোমার তো জাইত কুল দেইখাই বিয়া দিছিল- জীবনে সুখ পাইছ কোনদিন?"[২৮] ওদিকে যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত মিলন ভালোবাসার পাত্রী সন্ধ্যাকে দূরে রাখে। কাপুরুষতার তকমা গায়ে মেখে মিলন বিদায় নেয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আর জাতিগত সংস্কারের চাপে পড়ে দুটি নিষ্পাপ জীবনের নিদারুন অপচয় ঘটে।

'সীমান্তের ডাক' নাটকটি ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধের পটভূমিতে লেখা হয়েছিল। এই নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে স্বাধীনতা সংগ্রামী শিবনাথ ও তার পরিবার। দেশ বিভাগের সময় এদেশের উদ্বাস্তু কলোনীতে আশ্রয় পেয়েছিলেন। টিউশানি করে স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে কোনোরকমে দিনাতিপাত করেন। দেখেছেন দাঙ্গা, স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়ে জেলও খেটেছেন তবু তিনি এই দেশকে ভালোবাসেন। শিবনাথবাবু বলেন,- "দেশ সেবা তো লগ্নী কারবার নয় যে, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদে আসলে আদায় করে নেবো।"[২৯] ভারত চীন যুদ্ধ শুরু হলে স্বাধীনতা সংগ্রামী শিবনাথবাবুর মন অস্থির হয়ে ওঠে। একমাত্র সমীর বাবা মাকে না জানিয়ে সেনাবাহিনীতে নাম লেখায়। সীমান্তের ডাকে একমাত্র পুত্রের সাড়া দেওয়াতে শিবনাথ বাবু গর্ববোধ করেন। ক্রন্দনরতা মাকে সমীর সান্ত্বনা দেয়,-"ভেবনা মা তুমি। যেদিন রণে যাবো সেদিন বারুদের গন্ধ হবে তোমার আরতির ধূপের ধোঁয়া-কামানের লাল গোলা হবে তোমার সন্ধ্যা প্রদীপ- পরিখা হবে কোমল দুটি বাহু। অক্ষয় কবচ হবে তোমার স্নেহ চুম্বন-আর বীজমন্ত্র হবে বন্দেমাতরম।"[৩০]

নাটকে বিপ্লবী শিবনাথবাবু দরিদ্র বস্তিজীবনের দুঃখ ভুলে গিয়েছেন এই দেশকে ভালোবেসে। স্বাধীনতার ১৫বছর পরেও উদ্বাস্তু মানষগুলোর জীবনযাত্রায় বিশেষ কোনো উন্নতিই হয়নি। দেশ তাকে বিশেষ কিছুই দেয়নি তবু তিনি দেশকে ভালোবাসেন। তাই সীমান্তের ডাকে একমাত্র পুত্রের যুদ্ধে যোগদানে তিনি গর্ব অনুভব করেন। উদ্বাস্তু শিবনাথবাবুর নিস্বার্থ স্বদেশপ্রেমকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দিয়েছেন নাট্যকার।

এছাড়া অন্যান্য নাটকেও প্রসঙ্গক্রমে উদ্বাস্তু চরিত্র ও উদ্বাস্তু সমস্যা তুলে ধরেছেন নাট্যকার।

তথ্যসূত্র:

১) http://www.unrefugees.org/what-is-a-refugee/
২) ড. মন্দিরা রায়, নবান্নঃ পঞ্চাশের মন্বন্তরের স্বরূপ, বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকর্ম ও সমকালীন প্রেক্ষিত, প্রথম প্রজ্ঞাবিকাশ সংস্করণ-২০১০, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা-১০২।
৩) Suranjan Das, Communal Riots in Bengal 1905-1947, Oxford University Press, Bombay Calcutta Madras, New Delhi, 1991, Page-2
৪) মিজানুর রহমান, দেশ বিভাগ বাংলা নাটক, প্রথম সংস্করণ-২০১০, শ্রীভারতী প্রেস, কলকাতা, পৃঃ- ২২।
৫) তাপস ভট্টাচার্য, বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন, প্রথম প্রকাশ ১৪১১, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩।
৬) ড. দীপক চন্দ্র, বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা, তৃতীয় সংস্করণ-নভেম্বর ২০০৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৮২।
৭) দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উৎসর্গ', দীপশিখা, বেঙ্গল পাব্লিশার্স, কলকাতা-৭৩।
৮) দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপশিখা, বেঙ্গল পাব্লিশার্স, কলকাতা, প্রথম দৃশ্য।
৯) ঐ
১০) ঐ
১১) ঐ
১২) সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ভূমিকা', দেশভাগ ও বাংলা সাহিত্যঃ বর্তমান প্রেক্ষিতে, প্রথম সংস্করণ- ২০১৫, বঙ্গীয় সাহিত্য, কলকাতা।
১৩) দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাস্তুভিটা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পুস্তকালয়, দেশবন্ধুনগর, কলকাতা, পৃঃ- ১
১৪) ঐ, পৃঃ- ২
১৫) ঐ পৃঃ- ১১
১৬) বিষ্ণু বসু, 'মশাল' নিয়ে দু'চার কথা, গণনাট্য, ঊনত্রিশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ-১৯৯৩, পৃঃ-১৩
১৭) দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্রোড়পত্রঃ মশাল, গণনাট্য, ঊনত্রিশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ-১৯৯৩, পৃঃ-২৯,৩০
১৮) দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনস্রোত, পুস্তকালয়, দেশবন্ধুনগর, কলকাতা, দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য।
১৯) দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নেপথ্য ভূমিকা', ত্রিস্রোতা, প্রথম প্রকাশ-১৯৮২, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা।
২০) দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নয়া শিবির, ত্রিস্রোতা, প্রথম প্রকাশ-১৯৮২, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, পৃঃ-৫
২১) দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নয়া শিবির, ত্রিস্রোতা, প্রথম প্রকাশ-১৯৮২, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, পৃঃ-৭
২২) দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নয়া শিবির, ত্রিস্রোতা, প্রথম প্রকাশ-১৯৮২, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, পৃঃ-৯৮
২৩) দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণগ্রাস, পুস্তকালয়, কলকাতা, প্রথম দৃশ্য।
২৪) দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এপিঠ-ওপিঠ, একাঙ্ক সপ্তক, প্রথম প্রকাশ-১৯৫৮, পুস্তকালয়, দেশবন্ধুনগর, কলকাতা, পৃঃ-২৪
২৫) দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এপিঠ-ওপিঠ, একাঙ্ক সপ্তক, প্রথম প্রকাশ-১৯৫৮, পুস্তকালয়, দেশবন্ধুনগর, কলকাতা, পৃঃ-২৫
২৬) দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অপচয়, একাঙ্ক সপ্তক, প্রথম প্রকাশ-১৯৫৮, পুস্তকালয়, দেশবন্ধুনগর, কলকাতা, পৃঃ-২
২৭) ঐ, পৃঃ-১০

২৮) ঐ, পৃঃ-১৫
২৯) দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সীমান্তের ডাক, একাঙ্ক বিচিত্রা, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৬, মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।
৩০) ঐ